আবাসা

৮০

নামকরণ

এই সূরার প্রথম শব্দ عَبَسَ কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণ একযোগে এ সূরা নাযিলের নিম্নরূপ কারণ বর্ণনা করেছেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে মক্কা মুয়ায্‌যমার কয়েক জন বড় বড় সরদার বসেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করার জন্য তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছিলেন। এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) নামক একজন অন্ধ তাঁর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। তার এই পশ্নে সরদারদের সাথে আলাপে' বাধা সৃষ্টি হওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হলেন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সূরাটি নাযিল হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এ সূরা নাযিলের সময়–কাল সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন ঃ أَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيْمًا (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন) এবং هُوَ مِمَّنْ أَسْلَمَ قَدِيْمًا (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তরভুক্ত)। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের একেবারেই শুরুতে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, যেসব হাদীসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তার কোন কোনটি থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটির আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন কোন হাদীস থেকে প্রকাশ হয়, এ সময় তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সত্যের সন্ধানেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন। হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা মতে, তিনি এসে বলেছিলেন ঃ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْشِدْنِىْ "হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সত্য–সরল পথ দেখিয়ে দিন।" (তিরমিয, হাকেম ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর, আবু লাইলা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি এসেই কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিখিয়েছেন আমাকে সেই জ্ঞান শেখান।" (ইবনে জারীর,

ইবনে আবী হাতেম) এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নবী এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইবনে যায়েদ তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (হয়তো সে পরিশুদ্ধ হবে) এর অর্থ করেছেন لَعَلَّهُ يُسْلِمُ (হয়তো সে ইসলাম গ্রহণ করবে)। (ইবনে জারীর) আবার আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ "তুমি কী জানো, হয়তো সে সংশোধিত হয়ে যাবে অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হবে এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হবে?" এ ছাড়া আল্লাহ এও বলেছেন ঃ "যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং ভীত হয় তার কথায় তুমি কান দিচ্ছো না।" একথা থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, তখন তার মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের গভীরতর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই হেদায়াতের উৎস মনে করে তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই নিজের চাহিদা পূরণ হবে বলে মনে করছিলেন। তাঁর অবস্থা একথা প্রকাশ করছিল যে, তাঁকে সত্য সরল পথের সন্ধান দেয়া হলে তিনি সে পথে চলবেন।

তৃতীয়ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে সে সময় যারা উপস্থিত ছিল বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তারা ছিল উতবা, শাইবা, আবু জেহেল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ ইসলামের ঘোর শত্রুরা। এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটি তখনই ঘটেছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই লোকগুলোর মেলামেশা বন্ধ হয়নি। তাদের সাথে বিরোধ ও সংঘাত তখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, তাঁর কাছে তাদের আসা যাওয়া এবং তাঁর সাথে তাদের মেলামেশা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। এসব বিষয় প্রমাণ করে, এ সূরাটি একেবারেই প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আপাতদৃষ্টিতে ভাষণের সূচনায় যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা দেখে মনে হয়, অন্ধের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ও তার কথায় কান না দিয়ে বড় বড় সরদারদের প্রতি মনোযোগ দেবার কারণে এই সূরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কার ও তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পুরো সূরাটির সমস্ত বিষয়বস্তুকে একসাথে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আসলে এখানে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে কুরাইশদের কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে। কারণ এই সরদাররা তাদের অহংকার, হঠধর্মিতা ও সত্য বিমুখতার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের দাওয়াতকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। এই সংগে এখানে নবীকে তাঁর সত্য দীনের দাওয়াত দেবার সঠিক পদ্ধতি শেখাবার সাথে সাথে নবুওয়াত লাভের প্রথম অবস্থায় নিজের কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি যে পদ্ধতিগত ভুল করে যাচ্ছিলেন তা তাঁকে বুঝানো হয়েছে। একজন অন্ধের প্রতি তাঁর অমনোযোগিতা ও তার কথায় কান না দিয়ে কুরাইশ সরদারদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ এ ছিল না যে, তিনি বড়লোকদের বেশী সম্মানিত মনে করতেন এবং একজন অন্ধকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, নাউযুবিল্লাহ তাঁর চরিত্রে এই ধরনের কোন বক্রতা ছিল না যার ফলে আল্লাহ তাঁকে

পাকড়াও করতে পারেন। বরং আসল ব্যাপার এই ছিল, একজন সত্য দীনের দাওয়াত দানকারী যখন তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৃষ্টি চলে যায় জাতির প্রভাবশালী লোকদের দিকে। তিনি চান, এই প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক। এভাবে তাঁর কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর অন্যদিকে দুর্বল, অক্ষম ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন লোকদের মধ্যে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লেও তাতে সমাজ ব্যবস্থায় কোন বড় রকমের পার্থক্য দেখা দেয় না। প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রায় এই একই ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণের পেছনে একান্তভাবে কাজ করেছিল তাঁর আন্তরিকতা ও সত্য দীনের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার প্রেরণা। বড়লোকদের প্রতি সম্মানবোধ এবং গরীব, দুর্বল ও প্রভাবহীন লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ধারণা এর পেছনে মোটেই সক্রিয় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে বুঝালেন, এটা ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং এই দাওয়াতের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, যে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, সে যতই দুর্বল, প্রভাবহীন ও অক্ষম হোক না কেন আবার এর দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বহীন, যে নিজেই সত্যবিমুখ, সে সমাজে যত বড় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। তাই ইসলামের দাওয়াত আপনি জোরেশোরে সবাইকে দিয়ে যান কিন্তু যাদের মধ্যে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার আগ্রহ পাওয়া যায় তারাই হবে আপনার আগ্রহের আসল কেন্দ্রবিন্দু। আর যেসব আত্মম্ভরী লোক নিজেদের অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আপনি ছাড়া তাদের চলবে কিন্তু তারা ছাড়া আপনার চলবে না, তাদের সামনে আপনার এই দাওয়াত পেশ করা এই দাওয়াতের উন্নত মর্যাদার সাথে মোটেই খাপ খায় না।

সূরার প্রথম থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। তারপর ১৭ আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা নিজেদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা আল্লাহর মোকাবিলায় যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল প্রথমে সে জন্য তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের এই কর্মনীতির অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿১﴾ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿২﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴿৩﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿৪﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ﴿৫﴾ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿৬﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿৭﴾ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿৮﴾ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿৯﴾ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿১০﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿১১﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿১২﴾ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿১৩﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿১৪﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿১৫﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿১৬﴾

ভ্রুকুঁচকাল ও মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ সেই অন্ধটি তার কাছে এসেছে।[১] *তুমি কী জানো, হয়তো সে শুধরে যেতো অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হতো এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হতো? যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও, অথচ সে যদি শুধরে না যায় তাহলে তোমার ওপর এর কি দায়িত্ব আছে? আর যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে ভীত হচ্ছে, তার দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।*[২] *কখ্খনো নয়,*[৩] *এটি তো একটি উপদেশ,*[৪] *যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। এটি এমন সব বইতে লিখিত আছে, যা সম্মানিত, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র*[৫] *এটি মর্যাদাবান ও পূত চরিত্র লেখকদের*[৬] *হাতে থাকে।*[৭]

১. এই প্রথম বাক্যটির প্রকাশভংগী বড়ই চমকপ্রদ। পরবর্তী বাক্যগুলোতে সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ থেকে একথা প্রকাশ হয় যে, ভ্রুকুঁচকাবার ও মুখ ফিরিয়ে নেবার কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই করেছিলেন। কিন্তু বাক্যটির সূচনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মনে হয়েছে, তিনি নন অন্য কেউ এ কাজটি করেছে। এই প্রকাশভংগীর মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এটা আপনার করার মতো কাজ ছিল না। আপনার উন্নত চরিত্রের সাথে

পরিচিত কোন ব্যক্তি এ কাজটি দেখলে ভাবতো, আপনি নন বরং অন্য কেউ এ কাজটি করছে।

এখানে যে অন্ধের কথা বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে ভূমিকায় আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছি, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)। হাফেয ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল ইসতিআব' এবং হাফেয ইবনে হাজার 'আল ইসাবাহ' গ্রন্থে তাঁকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) ফুফাত ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, তাঁর মা উম্মে মাকতূম ছিলেন হযরত খাদীজার (রা) পিতা খুওয়াইলিদের সহোদর বোন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর এই আত্মীয়তার সম্পর্ক জানার পর তিনি যে তাঁকে গরীব বা কম মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং বড়লোকদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন শ্যালক। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন বরং অভিজাত বংশীয় ছিলেন। তাঁর প্রতি তিনি যে আচরণ করেছিলেন তা 'অন্ধ' শব্দটি থেকেই সুস্পষ্ট। রসূলের (সা) অনাগ্রহ ও বিরূপ আচরণের কারণ হিসেবে আল্লাহ নিজেই এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ রসূলে করীমের (সা) ধারণা ছিল, আমি বর্তমানে যেসব লোকের পেছনে লেগে আছি এবং যাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করছি তাদের একজনও যদি হেদায়াত লাভ করে তাহলে তার মাধ্যমে ইসলামের শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইবনে উম্মে মাকতূম হচ্ছেন একজন অন্ধ। দৃষ্টিশক্তি না থাকার কারণে এই সরদারদের মধ্য থেকে একজনের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের জন্য যতটা লাভজনক হবে ইবনে মাকতূমের ইসলাম গ্রহণ ততটা লাভজনক হতে পারে না। তাই তিনি মনে করেছিলেন, সরদারদের সাথে আলোচনার মাঝখানে বাধা না দিয়ে অন্য সময় তিনি যা কিছু জানতে চান জেনে নিতে পারবেন।

২. দীন প্রচারের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মূল বিষয়টির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেছিলেন। আর এই বিষয়টি বুঝাবার জন্যই মহান আল্লাহ প্রথমে ইবনে উম্মে মাকতূমের সাথে আচরণের ব্যাপারে তাঁকে পাকড়াও করেন। তারপর সত্যের আহবায়কের দৃষ্টিতে কোন্ জিনিসটি সত্যিকারভাবে গুরুত্ব লাভ করবে এবং কোন্ জিনিসটি গুরুত্ব লাভ করবে না তা তাঁকে জানান। একদিকে এক ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, বাতিলের অনুগামী হয়ে আল্লাহর গযবের মুখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত। তাই সত্য–সঠিক পথ সম্পর্কে জানার জন্য সে নিজে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। অন্যদিকে আর এক ব্যক্তির আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, সত্য সন্ধানের কোন আগ্রহই তার মনে নেই। বরং সে নিজেকে কারুর সত্য পথ জানিয়ে দেবার মুখাপেক্ষীই মনে করে না। এই দু' ধরনের লোকের মধ্যে কে ঈমান আনলে দীনের বেশী উপকার হতে পারে এবং কার ঈমান আনা দীনের প্রচার এই প্রসারের বেশী সহায়ক নয়, এটা দেখার বিষয় নয়। বরং এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, কে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেকে সুধরে নিতে প্রস্তুত এবং কে হেদায়াতের এই মূল্যবান সম্পদটির আদতে কোন কদরই করে না। প্রথম ধরনের লোক অন্ধ, কানা খোঁড়া, অংগহীন সহায় সম্বল শক্তি সামর্থহীন হলে এবং বাহ্যত দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের অবদান রাখার যোগ্যতা

সম্পন্ন না হলেও হকের আহবায়কের কাছে তিনিই হবেন মূল্যবান ব্যক্তি। তার দিকেই তাঁকে নজর দিতে হবে। কারণ এই দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দাদের জীবন ও কার্যক্রম সংশোধন করা। আর এই ব্যক্তির অবস্থা একথা প্রকাশ করছে যে, তাকে উপদেশ দেয়া হলে সে সংশোধিত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা সমাজে যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, সত্যের আহবায়কের তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতিই প্রকাশ্যে একথা জানাচ্ছে যে, তারা সংশোধিত হতে চায় না। কাজেই তাদের সংশোধন করার প্রচেষ্টায় সময় ব্যয় করা নিছক সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা সংশোধিত হতে না চাইলে তাদেরই ক্ষতি, সত্যের আহবায়কের ওপর এর কোন দায়–দায়িত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ এমনটি কখনো করো না। যেসব লোক আল্লাহকে ভুলে আছে এবং যারা নিজেদের দুনিয়াবী সহায়–সম্পদ ও প্রভাব–প্রতিপত্তির অহংকারে মত্ত হয়ে আছে, তাদেরকে অযথা গুরুত্ব দিয়ো না। ইসলামের শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যে, যে ব্যক্তি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার সামনে নতজানু হয়ে তা পেশ করতে হবে। আবার এই ধরনের অহংকারী লোককে ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য এমন ধরনের কোন প্রচেষ্টা চালানোও তোমার মর্যাদা বিরোধী, যার ফলে সে এ ভুল ধারণা করে বসে যে, তার সাথে তোমার কোন স্বার্থ জড়িত আছে এবং সে মেনে নিলে তোমার দাওয়াত সম্প্রসারিত হবার পথ প্রশস্ত হবে। অন্যথায় তুমি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে সত্যের যতটা মুখাপেক্ষী নয় সত্যও তার ততটা মুখাপেক্ষী নয়।

৪. অর্থাৎ কুরআন।

৫. অর্থাৎ সব ধরনের মিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এর মধ্যে নির্ভেজাল সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোন ধরনের বাতিল, অসৎ ও অন্যায় চিন্তা ও মতবাদের কোন স্থানই সেখানে নেই। দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগুলো যেসব ময়লা–আবর্জনা ও দুর্গন্ধে ভরে তোলা হয়েছে, তার সামান্য গন্ধটুকুও এখানে নেই। মানুষের চিন্তা–ভাবনা কল্পনা বা শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও দুরভিসন্ধি সবকিছু থেকে তাকে পাক–পবিত্র রাখা হয়েছে।

৬. এখানে একদল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ অনুসারে কুরআনের বিভিন্ন অংশ লেখা, সেগুলোর হেফাজত করা এবং সেগুলো হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছিয়ে দেবার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের প্রশংসায় এখানে দু'টি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। একটি হচ্ছে মর্যাদাবান এবং অন্যটি পূত চরিত্র। প্রথম শব্দটির মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাঁরা এত বেশী উন্নত মর্যাদার অধিকারী যার ফলে যে আমানত তাঁদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে তা থেকে সামান্য পরিমাণ খেয়ানত করাও তাঁদের মতো উন্নত মর্যাদার অধিকারী সত্তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহার করে একথা জানানো হয়েছে যে, এই কিতাবের বিভিন্ন অংশ লেখার, সেগুলো সংরক্ষণ করার এবং সেগুলো রসূলের কাছে পৌছাবার যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে পূর্ণ বিশ্বস্ততা সহকারে তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৭. যে ধারাবাহিক বর্ণনায় এই আয়াতগুলো উদ্ধৃত হয়েছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যায়, এখানে নিছক কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার জন্য তার

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ
فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٢٢﴾
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا
الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا
وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

লানত[৮] মানুষের প্রতি,[৯] সে কত বড় সত্য অস্বীকারকারী![১০] কোন্ জিনিস থেকে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন? এক বিন্দু শুক্র থেকে।[১১] আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন,[১২] তারপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করেছেন[১৩] তারপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং কবরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[১৪] তারপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন।[১৫] কখ্খনো নয়, আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালন করার হুকুম দিয়েছিলেন তা সে পালন করেনি।[১৬] মানুষ তার খাদ্যের দিকে একবার নজর দিক।[১৭] আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি।[১৮] তারপর যমীনকে অদ্ভুতভাবে বিদীর্ণ করেছি।[১৯] এরপর তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খেজুর, ঘন বাগান, নানা জাতের ফল ও ঘাস তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জীবন ধারণের সামগ্রী হিসেবে।[২০]

এই প্রশংসা করা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব অহংকারী লোক ঘৃণাভরে এর দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তাদেরকে পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দেয়া যে, এই মহান কিতাবটি তোমাদের সামনে পেশ করা হবে এবং তোমরা একে গ্রহণ করে তাকে ধন্য করবে, এই ধরনের কোন কার্যক্রম এর জন্য কোন প্রয়াজন নেই এবং এটি এর অনেক উর্ধে। এ কিতাব তোমাদের মুখাপেক্ষী নয় বরং তোমরাই এর মুখাপেক্ষী। নিজেদের ভালো চাইলে তোমাদের মন-মগজে যে শয়তান বাসা বেঁধে আছে তাকে সেখান থেকে বের করে দাও এবং সোজা এই দাওয়াতের সামনে মাথা নত করে দাও। নয়তো তোমরা এর প্রতি যে পরিমাণ অমুখাপেক্ষিতা দেখাচ্ছো এটি তার চাইতে অনেক বেশী তোমাদের অমুখাপেক্ষী। তোমরা একে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করলে এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সামান্যতম পার্থক্যও দেখা দেবে না। তবে এর ফলে তোমাদের গর্ব ও অহংকারের গগণচুম্বী ইমারত ভেঙে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে।

৮. এখান থেকে আল্লাহর সত্য দীনের প্রতি মুখাপেক্ষিতা অস্বীকার করে আসছিল এমন ধরনের কাফেররা ক্রোধের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে। এর আগে সূরার শুরু থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে পর্দান্তরালে কাফেরদের প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করা হয়েছে। সেখানে বর্ণনাভংগী ছিল নিম্নরূপ : হে নবী। একজন সত্য সন্ধানীকে বাদ দিয়ে আপনি এ কাদের পেছনে নিজের শক্তি–সামর্থ ব্যয় করছেন? সত্যের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদের তো কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। আপনার মতো একজন মহান মর্যাদা সম্পন্ন নবীর পক্ষে কুরআনের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এদের সামনে পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

৯. কুরআন মজীদের এই ধরনের বিভিন্ন স্থানে মানুষ শব্দটি মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়নি। বরং সেখানে মানুষ বলতে এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের অপছন্দীয় গুণাবলীর নিন্দা করাই মূল লক্ষ হয়ে থাকে। কোথাও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ঐসব অপছন্দনীয় গুণাবলী পাওয়া যাওয়ার কারণে "মানুষ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও এর ব্যবহারের কারণ এই দেখা দিয়েছে যে, বিশেষ কিছু লোককে নির্দিষ্ট করে যদি তাদের নিন্দা বা তিরস্কার করা হয় তাহলে তার ফলে তাদের মধ্যে জিদ ও হঠধর্মিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার জন্য সাধারণভাবে কথা বলার পদ্ধতিই বেশী প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়।

১০. এর আর একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ "কোন্ জিনিসটি তাকে সত্য অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? অন্য কথায় বলা যায়, কিসের জোরে সে কুফরী করে? কুফরী অর্থ এখানে সত্য অস্বীকার হয়, নিজের উপকারীর উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাও হয়, আবার নিজের স্রষ্টা, মালিক, প্রভূ ও রিযিকদাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মতো আচরণ করাও হয়।

১১. অর্থাৎ প্রথমে তো তার নিজের মৌলিক সত্তা সম্পর্কে একটু চিন্তা করা দরকার। কোন্ জিনিস থেকে সে অস্তিত্ব লাভ করেছে? কোথায় সে লালিত হয়েছে? কোন্ পথে সে দুনিয়ায় এসেছে? কোন ধরনের অসহায় অবস্থার মধ্যে দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে? নিজের এই প্রকৃত অবস্থা ভুলে গিয়ে সে কেমন করে "আমার সমতুল্য কেউ নেই" বলে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে? নিজের স্রষ্টার প্রতি বিদ্রূপ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা সে কোথায় থেকে পেলো? (এই একই কথা সূরা ইয়াসীনের ৭৭–৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে)।

১২. অর্থাৎ সে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তার তকদীর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সে কোন্ লিংগের হবে? তার গায়ের রং কি হবে? সে কতটুকু উঁচু হবে? তার দেহ কতটুকু কি পরিমাণ মোটা ও পরিপুষ্ট হবে? তার অংগ–প্রত্যংগগুলো কতটুকু নিখুঁত ও অসম্পূর্ণ হবে? তার চেহারা সুরাত ও কন্ঠস্বর কেমন হবে? তার শারীরিক বল কতটুকু হবে? তার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা কতটুকু হবে? কোন্ দেশে, পরিবারে এবং কোন্ অবস্থায় ও পরিবেশে সে জন্মগ্রহণ করবে, লালিত পালিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গড়ে উঠবে? তার ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশ ও পরিবারের প্রভাব, পরিবেশের প্রভাব এবং তার নিজের ব্যক্তিসত্তা ও অহমের প্রভাব কি পর্যায়ে ও কতটুকু থাকবে? দুনিয়ার জীবনে সে কী ভূমিকা পালন করবে? পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে? এই

তকদীর থেকে এক চুল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতাও তার নেই। এর মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও সে করতে পারবে না। এত সব সত্ত্বেও তার একি দুঃসাহস, যে স্রষ্টার তৈরি করা তকদীরের সামনে সে এতই অসহায়, তার মোকালোয় সে কুফরী করে ফিরছে।

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তার জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। নয়তো স্রষ্টা যদি তার এই শক্তিগুলো ব্যবহার করার মতো এসব উপায় উপকরণ পৃথিবীতে সরবরাহ না করতেন তাহলে তার দেহ ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি ব্যর্থ প্রমাণিত হতো। এ ছাড়াও স্রষ্টা তাকে এ সুযোগও দিয়েছেন যে, সে নিজের জন্য ভালো বা মন্দ, কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা আনুগত্য বা অবাধ্যতার মধ্যে যে কোন পথ চায় গ্রহণ করতে পারে। তিনি উভয় পথই তার সামনে খুলে রেখে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি পথই তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এখন এর মধ্য থেকে যে পথে ইচ্ছা সে চলতে পারে।

১৪. অর্থাৎ কেবল তার সৃষ্টি ও তকদীরের ব্যাপারেই নয়, মৃত্যুর ব্যাপারেও তার স্রষ্টার কাছে সে একেবারেই অসহায়। নিজের ইচ্ছায় সে সৃষ্টি হতে পারে না। নিজের ইচ্ছায় মরতেও পারে না। নিজের মৃত্যুকে এক মুহূর্তকালের জন্য পিছিয়ে দেবার ক্ষমতাও তার নেই। যে সময় যেখানে যে অবস্থায়ই তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই সময় সেই জায়গায় সেই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। আর মৃত্যুর পর তার জন্য যে ধরনের কবর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই ধরনের কবরেই সে স্থান লাভ করে। তার এই কবর মৃত্তিকা গর্ভে, সীমাহীন সাগরের গভীরতায়, অগ্নিকুণ্ডের বুকে বা কোন হিংস্র পশুর পাকস্থলীতে যে কোন জায়গায় হতে পারে। মানুষের তো কোন কথাই নেই, সারা দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি মিলে চেষ্টা করলেও কোন ব্যক্তির ব্যাপারে স্রষ্টার এই সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না।

১৫. অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্রষ্টা আবার যখন তাকে জীবিত করে উঠাতে চাইবেন তখন তার পক্ষে উঠতে অস্বীকার করার ক্ষমতাও থাকবে না। প্রথমে সৃষ্টি করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করে সৃষ্টি করা হয়নি। সে সৃষ্টি হতে চায় কিনা, এ ব্যাপারে তার মতামত নেয়া হয়নি। সে সৃষ্টি হতে অস্বীকার করলেও তাকে সৃষ্টি করা হতো। এভাবে এই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিও তার মর্জির ওপর নির্ভরশীল নয়। মরার পর সে আবার উঠতে চাইলে উঠবে, আবার উঠতে অস্বীকার করলে উঠবে না, এ ধরনের কোন ব্যাপারই এখানে নেই। এ ব্যাপারেও স্রষ্টার মর্জির সামনে সে পুরোপুরি অসহায়। যখনই তিনি চাইবেন তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাকে উঠতে হবে, সে হাজার বার না চাইলেও।

১৬. হুকুম বলতে এখানে এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যা স্বাভাবিক পথনির্দেশনার আকারে মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন। এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যেদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্ব এবং পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি অণু পরমাণু এবং আল্লাহর অপরিসীম শক্তি সমন্বিত প্রতিটি বস্তুই ইংগিত করছে। আবার এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যা প্রতি যুগে আল্লাহ নিজের নবী ও কিতাবের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং প্রতি যুগের সৎলোকদের মাধ্যমে যাকে চতুরদিকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা দাহার ৫ টীকা) এ প্রসংগে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ ওপরের আয়াতগুলোতে যেসব মৌলিক সত্যের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে মানুষের উচিত ছিল তার স্রষ্টার

আনুগত্য করা। কিন্তু সে উল্টো তাঁর নাফরমানির পথ অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর বান্দাহ হবার দাবী পূরণ করেনি।

১৭. অর্থাৎ যে খাদ্যকে সে মামুলি জিনিস মনে করে সে সম্পর্কে তার একবার চিন্তা করা দরকার। কিভাবে এই খাদ্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ যদি এর উপকরণগুলো সরবরাহ না করতেন তাহলে কি জমি থেকে এই খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল?

১৮. এর অর্থ বৃষ্টি। সূর্য তাপে সমুদ্র পৃষ্ঠের বিপুল বারি রাশিকে বাষ্পের আকারে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। তা থেকে সৃষ্টি হয় ঘন মেঘ। বায়ু প্রবাহ সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। তারপর মহাশূন্যের শীতলতায় সেই বাষ্পগুলো আবার পানিতে পরিণত হয়ে দুনিয়ার প্রত্যেক এলাকায় একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী বর্ষিত হয়। এরপর এই পানি সরাসরি পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, ভূগর্ভে কূয়া ও ঝর্ণার আকার ধারণ করে, নদীনালায় স্রোতের আকারেও প্রবাহিত হয়। আবার পাহাড়ে জমাট বাঁধা বরফের আকার ধারণ করে গলে যেতেও থাকে। এভাবে বর্ষাকাল ছাড়াও অন্যান্য মওসুমে নদীর বুকে প্রবাহিত হতে থাকে। এসব ব্যবস্থা কি মানুষ নিজেই করেছে? তার স্রষ্টা তার জীবিকার জন্য যদি এসবের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে মানুষ কি পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণ করতে পারতো?

১৯. যমীনকে বিদীর্ণ করার মানে হচ্ছে, মাটি এমনভাবে ফাটিয়ে ফেলা যার ফলে মানুষ তার মধ্যে যে বীজ, আঁটি বা চারা রোপণ বা বপন করে অথবা যা বাতাস ও পাখির মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে তার মধ্যে পৌঁছে যায় তা অংকুর গজাতে পারে। মানুষ বড় জোর মাটি খনন করতে বা তার মধ্যে লাঙল চালাতে পারে এবং আল্লাহ যে বীজ সৃষ্টি করেছেন তাকে মাটিতে রোপণ করতে পারে। এর বেশী সে কিছুই করতে পারে না। এ ছাড়া সমস্ত কাজ আল্লাহ করেন। তিনি অসংখ্য জাতের উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব বীজের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে মাটির বুকে এদের অংকুর বের হয় এবং প্রতিটি বীজ থেকে তার প্রজাতির পৃথক উদ্ভিদ জন্ম নেয়। আবার তিনি মাটির মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে তা পানির সাথে মিশে ঐ বীজগুলোর প্রত্যেকটির খোসা আলগা করে তার মুখ খুলে দেয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের জন্য তার উপযোগী খাদ্য সরবরাহ করে তার উদ্‌গম ও বিকাশ লাভে সাহায্য করে। আল্লাহ যদি এই বীজগুলোর মধ্যে এই বৈশিষ্ট সৃষ্টি না করতেন এবং মাটির এই ওপরি স্তরকে এই যোগ্যতা সম্পন্ন না করতেন তাহলে মানুষ কি এখানে কোন খাদ্য লাভ করতে পারতো?

২০. অর্থাৎ কেবল তোমাদের জন্যই নয়, তোমাদের যেসব পশু থেকে তোমরা গোশত, চর্বি, দুধ, মাখন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী লাভ করে থাকো এবং যারা তোমাদের আরো অসংখ্য অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে থাকে, তাদের জন্যও। এসব কিছুই কি এ জন্য করা হয়েছে যে, তোমরা এসব দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করে লাভবান হবে এবং যে আল্লাহর রিযিক লাভ করে তোমরা বেঁচে আছো তাঁর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে?

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো আওয়াজ আসবে[২১] সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে—নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে।[২২] তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না।[২৩] সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, হাসিমুখ ও খুশীতে ডগবগ করবে। আবার কতক চেহারা হবে সেদিন ধূলিমলিন, কালিমাখা। তারাই হবে কাফের ও পাপী।

২১. এখানে কিয়ামতের শেষ শিংগাধ্বনির কথা বলা হয়েছে। এই বিকট আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই মরা মানুষেরা বেঁচে উঠবে।

২২. প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে সূরা মা'আরিজের ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতে। পালাবার মানে এও হতে পারে যে, সেদিন মানুষ নিজের ঐসব প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনকে বিপদ সাগরে হাবুডুবু খেতে দেখে তাদের সাহায্যার্থে দৌড়ে যাবার পরিবর্তে উল্টো তাদের থেকে দূরে পালিয়ে যেতে থাকবে, যাতে তারা সাহায্যের জন্য তাকে ডাকতে না থাকে। আবার এর এ মানেও হতে পারে যে, দুনিয়ায় আল্লাহর ভয় না করে এবং আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যেভাবে তারা পরস্পরের জন্য গোনাহ করতে ও পরস্পরকে গোমরাহ করতে থেকেছে, তার কুফল সামনে স্বমূর্তিতে প্রকাশিত দেখে তাদের প্রত্যেকে যাতে অন্যের গোমরাহী ও গোনাহের দায়িত্ব কেউ তার ঘাড়ে না চাপিয়ে দেয় এই ভয়ে অন্যের থেকে পালাতে থাকবে। ভাই ভাইকে, সন্তান মা–বাপকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং মা–বাপ সন্তানকে এই মর্মে ভয় করতে থাকবে যে, নিশ্চয়ই এবার আমার বিরুদ্ধে মামলায় এরা সাক্ষী দেবে।

২৩. হাদীস গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও সনদ পরম্পরায় বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একেবারেই উলংগ হয়ে উঠবে।" একথা শুনে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন একজন (কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা, কোন বর্ণনা মতে হযরত সওদা আবার কোন বর্ণনা অনুযায়ী অন্য একজন মহিলা) ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কি সেদিন সবার সামনে খোলা থাকবে? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন, সেদিন অন্যের দিকে তাকাবার মতো হুঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। (নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, বাইহাকী ও হাকেম)।